দৈনিক সংবাদ

18

তারিখ ...13 MAY. 1997...
পৃষ্ঠা ...7... কলাম ...6...

শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে

মীর মাহফুজুল হক

বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক [illegible]য়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের [illegible]ভাবনার সাথে সাথে শিক্ষানীতি প্রণয়নের [illegible]ভাবনা করছেন যাকে ইতিবাচক উদ্যোগ বলে মনে করা যায়। ১৯৭৪ সালে যে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা [illegible]নের মুখ দর্শন করেনি। এমন অবস্থায় দেশে [illegible] শিক্ষানীতি নেই বলা চলে, শুধুমাত্র [illegible]নের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকার শিক্ষা সম্পর্কে [illegible] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছেন যেগুলো অত্যন্ত [illegible]; ফলে ঐগুলো দেশের ছাত্র-শিক্ষক-[illegible]সহ জনমনে তেমন রেখাপাত করতে [illegible] এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে বাস্তবিক [illegible] মত অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। অথচ গত [illegible]৬ বছর পূর্বের স্বাধীনতা অর্জনের পর এদেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সথে সঙ্গতি রেখে একটি সঠিক যুগোপযোগী দেশজ শিক্ষানীতি প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন অপরিহার্য ছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক হিসেবে শিক্ষা দেশে দেশে যুগে যুগে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানের আলো দেয়, [illegible]তা নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করে এবং সংস্কৃতিবান করে [illegible]তে সহায়তা দান করে। পৃথিবীর সব দেশে আজ [illegible]ই শিক্ষাকে নিয়ে চলছে নতুন নতুন চিন্তাভাবনা। শিক্ষাকে জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দেয়ার উদ্যোগ আয়োজন আজ পৃথিবীর সর্বত্রই পরিলক্ষিত। তবে পৃথিবীর উন্নত যেসব দেশে আজ শিক্ষার চরম বিস্তৃতি ঘটেছে, সেসব দেশেও শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা এসেছে, সংকট দেখা দিয়েছে কোন কোন সময়। কিন্তু সে সংকটের সফল উত্তরণও সেসব দেশে সম্ভব হয়েছে। ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পেরেছে আধুনিক উন্নত বিশ্বের [illegible]গুলো।

[illegible] অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সেই [illegible] আমলের শিক্ষাসূচি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, [illegible]কানুন ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে দ্রুত [illegible]শীল সমাজে স্বাভাবিকভাবেই অযোগ্য ও [illegible] তাই দেখা যায়, শিক্ষক সমাজ পেশাগত [illegible]নোনিবেশ করতে পারছেন না এবং সাথে [illegible]সমাজের চরিত্র গঠনেও ইতিবাচক কোন [illegible] গ্রহণ করতে পারছেন না। ফলে বর্তমান [illegible]দেশের শিক্ষাঙ্গনে পবিত্রতা, আন্তরিকতা, [illegible]শীলতা ও সৃজনশীল মননশীলতার দারুণ [illegible]লক্ষিত হচ্ছে। আমাদের অভিভাবকবৃন্দও [illegible] তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ [illegible] অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অভিভাবকবৃন্দ [illegible] নেতিবাচক কার্যকলাপে গা ভাসিয়ে দেন [illegible] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের উপর [illegible]চিত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের ছাত্ররা এখনও যেহেতু অভিভাবকদের উপর নির্ভরশীল, অতএব উদ্দেশ্য কল্যাণমূলক হলে আমাদের অভিভাবকগণ ছাত্রদের ক্রিয়াকলাপকে আশানুরূপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। অনেকক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির ধারা পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ছাত্র সংগঠনগুলো যেন আদর্শগত কারণে জন্ম হয়নি; বরং কোন বিশেষ মহলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছাত্র সংগঠনের জন্ম হয়েছে। শিক্ষা তথা জাতির জন্য এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। ফলস্বরূপ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক দল এবং সরকার ছাত্র উচ্ছৃংখলতার বিরুদ্ধে কোন সময় বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন না। "বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অবস্থা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত"- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন উপাচার্যের এ উক্তিকে সঠিক প্রমাণ করে বার বার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্যগণ পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সরকার, রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য দায়িত্বশীল সচেতন মহলের দুর্বলতা শিক্ষা তথা জাতীয় প্রগতির পরিপন্থী। উপরোক্ত বক্তব্যগুলো এজন্যই লেখা যে, উল্লেখিত বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে সরকার তার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত, গঠনমূলক ও গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নে অগ্রসর হবেন; পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মহল শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা প্রদান করা। নচেৎ শিক্ষানীতি যত গঠনমূলকই হোক না কেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল সম্পর্কেও নীতি প্রণয়ন হওয়া উচিত যাতে পক্ষগুলো অর্থাৎ সরকার, অভিভাবক ছাত্রশিক্ষক ও রাজনীতিবিদ মানসিকভাবে সন্তুষ্টচিত্তে শিক্ষার প্রতি আত্মনিয়োগ করতে পারে। শিক্ষা ব্যক্তিসমাজ তথা দেশের জন্য কি অবদান রাখতে সক্ষম সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার অবদান সম্পর্কে সন্দিহান হলে সংশ্লিষ্ট মহল শুধুমাত্র দায়সারা গোছের কার্যসম্পাদন করে যা বিপরীত ফলাফল বহন করে এনে সমাজ তথা দেশের অমঙ্গল করে। যে পাঠ্যবিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ তা হওয়া উচিত। পদার্থবিদ্যা বা প্রাণীবিদ্যার বিশেষজ্ঞরা যদি ব্যাংকিং সার্ভিসে লিপ্ত হয় অথবা বাণিজ্যের বিশেষজ্ঞরা আওতার বাইরে অন্য কোন সার্ভিসে যোগদান করলে পৃথক বিষয়ে অনার্স বা মাষ্টার্স ডিগ্রি অর্জনের সার্থকতা কোথায় ভেবে দেখা প্রয়োজন। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমনই যে, শুধুমাত্র ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী হওয়ার জন্যই যেন অধিকাংশ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান পড়ে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা বা বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে উপায়ন্তর না দেখে নেয়ায়েৎই শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জনের জন্য ভর্তি হয়। তাই পরিপূর্ণ বাস্তবসম্মত শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনকারীদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা এবং বিশেজ্ঞতা বাছাই করে চাকরি প্রদান করা। তাহলে বিভিন্ন বিভাগে যেমন প্রতিযোগিতা হ্রাস পাবে, তেমনি অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। আবার লক্ষণীয় যে, সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান সর্বদাই বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে। এর অর্থ কি এই যে, বাণিজ্য বা, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা চিরস্থায়ীভাবে বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ে এতই কম মেধাবী যে অন্তত একবারের জন্যও সম্মিলিত মেধায় তারা স্থান করে নিতে পারে না? প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতির ভিন্নতা এ জন্য দায়ী। এ অবস্থায় পৃথক পৃথক মেধাতালিকার প্রচলন করা অথবা মূল্যায়ন পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি জড়িত শিক্ষকদের অন্ততপক্ষে মানসিক সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে শিক্ষাদান কার্যক্রম কার্যভাবে সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে কলেজ পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায়, শিক্ষকরা আন্তঃ ক্যাডার বৈষম্যের শিকার, এমনকি ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সেও শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; অথচ এতে সরকারের কোন আর্থিক খরচের প্রয়োজন হয় না। ঢালাওভাবে বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের ফলেও জ্যেষ্ঠতার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে নানা জটিলতা। বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ক্যাডারভুক্তি শিক্ষক ও জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মানসিক বৈষম্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষাজীবনে যে ফলাফল প্রয়োজন হয়; জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের সে ফলাফল থাকে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে বেসরকারি কলেজে নিয়োগলাভ করে পরবর্তীতে দেন-দরবারের মাধ্যমে জাতীয়করণকৃত হচ্ছে। ইদানীংকালে অনুদান প্রদান পরিমাণের উপর নিয়োগ যোগ্যতা অর্জিত হচ্ছে; ফলে অধিকতর যোগ্যতা ও মেধাসম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগলাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমতাবস্থায় ঢালাওভাবে কলেজ সরকারিকরণ না করে বেসরকারি অবস্থায়ই জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সংগতি বিধান করে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা পেতে পারে। এক্ষেত্রে একদিকে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা যেমন যুক্তিসংগত সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন, অন্যদিকে জ্যৈষ্ঠতা নির্ধারণসহ অন্যান্য জটিলতা থেকে উভয় ক্যাটাগরির শিক্ষকবৃন্দ রেহাই পেতে পারেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা ও দুনীতিমুক্ততা প্রয়োজন। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ রাজনীতি বা দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থাকা বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় যে, আবশ্যিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। কেউ বলছেন কৃষি আবশ্যিক করা উচিত, কেউ বলছেন ধর্ম, কেউবা অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করছেন। আমার মনে হয়, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল বিষয় সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সকল বিষয় আবশ্যিক করা যেতে পারে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় মান বন্টন করে সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। সাথে সাথে হাতেকলমে শিক্ষাদানসহ কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা না পেলেও ঐ শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত শিক্ষার গন্ডির মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। কৃষি কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে আমাদের কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের আধুনিক কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা যেন উৎপাদনশীল গবেষণা কর্ম ও উন্নত কৃষিকাজের উদ্ভাবনকারী হয়ে উঠে মাটি ও মানুষকে ভালবাসতে শেখে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসারের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ গণমুখী উৎপাদনশীল কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। আর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উৎসাহের ভিত্তিতে পছন্দমত বিষয় নির্ধারণ করার সুযোগ থাকতে হবে যাতে বিশেষায়িত অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সমাজ তথা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ধনাত্মক পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

ছাত্রছাত্রী সংখ্যার কথা বিবেচনা করে আনুপাতিক হারে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে সারাদেশে এক রকম ব্যবস্থাই কাম্য। বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতি চালু রয়েছে, সব কিছুকে সমন্বিত করে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। পাড়ায় পাড়ায় অলিতে গলিতে কিন্ডারগার্টেন, স্কুলগুলো এক একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যেগুলো সাধারণ শ্রমজীবী কর্মজীবী মানুষের সন্তানদের কোন কাজে লাগে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে উঁচু ও নিচুবোধ ছাত্রছাত্রীদের ভিতর থেকে দূরীভূত হয় এবং ছাত্রশিক্ষক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে তার জন্য পরিকল্পিত ও বিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। নিম্নতর স্তর থেকে সাপ্তাহিক পরীক্ষা চালু করে সারাবছরই একটা পরীক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা দরকার। বার্ষিক পরীক্ষায় সাপ্তাহিক পরীক্ষার নম্বর যোগ করে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর ক্লাসে উত্তীর্ণ করতে হবে এবং শিক্ষকবৃন্দের হাতে ১০%-২০% নম্বর শ্রেণী পারফরমেন্সের জন্য রাখতে হবে যা ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা সৃষ্টির সাথে সাথে শিক্ষকবৃন্দের প্রতি অনুগত মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যেটুকু জানা যাচ্ছে, তাতে বুঝা যায় যে, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে দেশে তিনস্তর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে যাতে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা স্তর, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর এবং পরবর্তী স্তর উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে। এটা যদি বাস্তবায়িত হয় তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, শিক্ষক নিয়োগে সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে বিশেষ করে প্রস্তাবিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে। অচিরেই যে খসড়া রিপোর্ট প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তার উপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ করে শিক্ষার সাথে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদের মতামত নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ ও তার ভিত্তিতে সর্বশেষ নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিফলনের মাধ্যমে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণীত হবে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, পৃথিবীর অনেক দেশই বিপ্লব বা স্বাধীনতার পর তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমূল সংস্কার করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এবং কর্মক্ষম শিক্ষিত নাগরিক তৈরির জন্য শিক্ষাকে এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছে যাতে এক ব্যক্তি নিজেকে দেশের যেকোন উৎপাদনশীল খাতে নিয়োগ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নকামী একটা দেশ। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলি আমাদের বহুবিধ, বিভিন্নমুখী এবং সর্বব্যাপক। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ সংকট আরও মারাত্মক এ বাস্তবতা অনুধাবন করে মানব কল্যাণমুখী, উৎপাদনশীল, গতিশীল ও অহমিকাশূন্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে সরকার, অভিভাবক, শিক্ষক-ছাত্র, রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি সর্বস্তরের সচেতন মহল এগিয়ে আসবে এটাই অন্তরের প্রত্যাশা।